কাহিনির উৎস সন্ধান : উনিশ শতকের সমাজ ও মানুষের কথা

সধবার একাদশী উনিশ শতকের বাংলাদেশ বিশেষত নগর কলকাতার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের নিদর্শন। একদল ইংরেজি শিক্ষিত ধনীর দুলাল কীভাবে বিপথগামী হয়ে উঠল, কতখানি বিকৃত নিম্নরুচির জীবনচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং কীভাবেই বা সেই বিকৃতিকে উৎসাহ জুগিয়েছিল তাদেরই পরিবার, তারই ভয়াবহ ছবি নাটকটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এই কাহিনির উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের সংক্ষেপে বুঝে নিতে হবে সমকালীন সময়কে।

আমরা সকলেই জানি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষার তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সূচনা হয়। হিন্দু কালেজ ছিল সেই শিক্ষাচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক। এই কলেজেরই তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রচলিত প্রথা রীতি-নীতিকে যুক্তির কাঠগড়ায় বিচার করে দেখা, শ্রেষ্ঠকে গ্রহণ করা— প্রভৃতি আমাদের তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা বিনা যুক্তিতে কোনো কিছুকেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ১৮২৮-এ ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। ডিরোজিও শিষ্যরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের দেশের প্রচলিত চিরাচরিত প্রথা রীতি-নীতি-

সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভাববন্যা ঘটাতে চেয়েছিলেন। সংস্কারের শিকল কাটতে তাঁরা বহিরঙ্গে বেশ কিছু দেখুনেপনা গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজের অনুকরণে এঁরা মদ্যপান করতেন, তাঁদের মতোই পোশাক পরতেন, ইংরেজিতে কথা বলতেন, সভা-সমিতি করতেন, বক্তৃতা দিতেন। অনেকটা কালাপাহাড়ি মানসিকতা নিয়েই এঁরা মদ্যপান করতেন, বারাঙ্গনা সঙ্গ করতেন, নিষিদ্ধ মাংস অর্থাৎ গো-মাংস প্রকাশ্যে খেতেন। যৌবনের অতি উচ্ছৃঙ্খলতায় যখন ওই দেখুনেপনাগুলো প্রবল হয়ে উঠল তখন তাঁদের সংস্কারপন্থী উদার আদর্শ অপেক্ষা ওই খারাপ দিকগুলিই সমাজে প্রভাব বিস্তার করল বেশি করে। অর্থাৎ ব্যভিচার ও বিকৃতিটাই হয়ে উঠল প্রধান।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে তাই বলা যায় বাঙালি সমাজের ভাঙচুরের সময়। ওই তরুণ প্রজন্মের শিক্ষিত ছাত্ররা তাঁদের কর্মে, চিন্তায়-ভাবনায় সমাজটাকে এভাবেই ভাঙতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিপুল ধাক্কায় নগর কলকাতা নিঃসন্দেহে চঞ্চল হয়ে উঠল নানান ভাবসংঘাতে।

একদিকে থাকলেন ওই র‍্যাডিক্যাল ইয়ংবেঙ্গলপন্থীরা—যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত, কিন্তু সংস্কারের ব্যাপারে চরমপন্থী। এঁদেরই প্রতিনিধি যৌবনের কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত প্রমুখরা। এই প্রতিভাবান ইয়ংবেঙ্গলীয়রা পরবর্তীকালে চরমপন্থা ছেড়ে প্রায় সকলেই স্বদেশিভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির উন্নতির জন্য শেষ বয়সে তাঁরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার নবজাগরণের এঁরাই ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক।

এই র‍্যাডিক্যালদের প্রভাব সমাজের যুব শ্রেণির মধ্যে বেশি করে পড়ে। কিন্তু তা ছিল অনেকটা নেগেটিভ অর্থে। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে। ক্রমে মদ্যপান, বারাঙ্গনাসঙ্গ, শৌখিন সভা-সমিতি চর্চা, ইংরেজি আদবকায়দা—পোশাকে এবং আচার-আচরণে ওই দেখুনেপনাটা সমাজের বিশেষ একটা শ্রেণির মধ্যে মহামারীর মতো ছড়িয়ে গেল। এই শ্রেণিটাই আমাদের সমাজে 'বাবু' নামে পরিচিত। সাধারণত ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে মফস্‌সল ও গ্রাম থেকে উঠে আসা সদ্যধনী ব্যবসায়ী বা মুৎসুদ্দি বা জমিদার সন্তানরাই ছিলেন 'বাবু'। প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে দু-একটা ইংরেজি বুলি আউড়ে, মো-সাহেব পরিবৃত্ত হয়ে এই নব্যবাবুরা উচ্ছৃঙ্খল ও বিকৃত জীবনচর্চায় সমাজকেই দূষিত করে তুললেন। এদের নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র 'বাবু' প্রবন্ধ লেখেন, মধুসূদন দত্ত লেখেন *একেই কি বলে সভ্যতা?*, এঁদেরকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৫-এ লিখেছিলেন নববাবুবিলাস। আমাদের আলোচ্য *সধবার একাদশী* এই শ্রেণির জীবনচর্চার-ই নগ্নচিত্র বলা যেতে পারে।

সমাজের একদিকে যখন এই নব্যযুগের পাশ্চাত্য জীবনচর্চার অনুকরণে ডিরোজিও-পন্থী র‍্যাডিক্যালদের বিপুল ধাক্কা আমাদের সনাতন সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে, ঠিক তখনই রামমোহন রায় তাঁর বিচিত্র সব আধুনিক চিন্তাভাবনায় আমাদের ঋদ্ধ করছেন। রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন তখন সংগঠিত রূপ

পেয়েছে। ১৮২৮, যে বছর ডিরোজিও তৈরি করেছিলেন অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন—ঠিক সেই বছরটিতেই রামমোহনের নেতৃত্বে সতীদাহ নিয়ে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ১৮২৯-এ লর্ড বেন্টিঙ্ক সমস্ত বাধাকে সামলে সতীদাহ নিয়ে আইন পাস করছেন। সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়া সনাতন ভারতীয় ধর্মের প্রচারকদের কাছে ছিল প্রচণ্ড এক ধাক্কা। অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা এই আইন আটকাতে পারেননি। রামমোহন শুধু হিন্দুধর্মের প্রাচীন ও অযৌক্তিক সংস্কারগুলিকে আঘাতই করেননি, তিনি বাঙালি জীবনচর্চায় আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যনীতির খুব বড়ো সমর্থক ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যনীতির প্রতিবাদ করে অবাধ শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য ইংল্যান্ডে দরবার করেছিলেন তিনি। এছাড়াও রামমোহনের অন্যতম কীর্তি হল, তিনি বিভিন্ন ধর্মের মূলনীতিগুলিকে আত্মসাৎ করে হিন্দু ও খ্রিশ্চান ধর্মের গোঁড়ামিগুলিকে আক্রমণ করেন। যাবতীয় সংকীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাস যা হিন্দুধর্মকে কলুষিত করেছিল, সেগুলির তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্গত ঐক্যের মধ্যে দিয়ে একটি বিশ্বজনীন ধর্মের সন্ধানও তিনি করেছিলেন। এই উদ্দেশেই একেশ্বরবাদীদের ধর্মচর্চা ও সাধনার জন্য ১৮২৮-এ রামমোহন 'ব্রহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন, যে ব্রহ্মসভা রামমোহন ভারত ছাড়ার কিছু কালের মধ্যেই 'ব্রহ্মসমাজ'-এর রূপ নেয়।[৬]

যাই হোক একদিকে রামমোহনের এইসব যুগান্তকারী কাজকর্ম অন্যদিকে ডিরোজিও-পন্থী র‍্যাডিক্যালদের প্রচণ্ড ভাঙচুর, উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের এই ভয়ংকর আলোড়নের দিনে আমাদের প্রাচীন হিন্দুসমাজ কিন্তু চুপ করে বসে ছিল না। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাচীন রীতিনীতি সংস্কারবাহিত, স্মৃতি ও শাস্ত্রশাসিত সমাজব্যবস্থার ভিতকে আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখন তারই প্রতিক্রিয়ায় তৈরি করল 'ধর্মসভা' (১৮৩০)। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ছিলেন এই ধর্মসভার প্রথম সভাপতি; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সমাচার চন্দ্রিকা* এই ধর্মসভার মুখপাত্র হয়ে ওঠে। তবে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, ইতিহাস যাঁদের রক্ষণশীল বলে দেগে দিয়েছিল তাঁদের ভিতরেও ছিল প্রাচীন ও আধুনিকতার বিচিত্র দ্বন্দ্বের ভাঙচুর। ধর্মসভার নেতা, সতীদাহ সমর্থক রাধাকান্ত দেবই আবার ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষার অন্যতম সমর্থক। ইংরেজি-শিক্ষা বিস্তারে রাধাকান্ত দেবের অবদান বিপুল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে যুগের তুলনায় অনেক প্রগতিবাদী বলে বর্ণনা করেছেন। আবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম জীবনে রক্ষণশীল মতের সমর্থক হলেও পরবর্তী সময়ে অনেক আধুনিক চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রামমোহনের মৃত্যুর পর কলকাতার বাঙালি সমাজের ভিতর জীবনচর্যার অনেকগুলি ধারা যেন গড়ে উঠল। একদিকে ওই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ—বিভিন্ন সংস্কারের গোঁড়ামিকে আঁকড়ে থেকে যাঁদের যাপন। আবার তাঁদের ভিতর থেকেই প্রভাবশালী সমাজপতি ব্রাহ্মণদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল, ঠিক মাইকেলের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*-র ভক্তপ্রসাদের মতোই। আর একদিকে ডিরোজিওর র‍্যাডিক্যাল ভাবধারায় দীক্ষিত

ইয়ংবেঙ্গলীয়দের রূপান্তর ঘটল দুভাবে। এক, স্বাভাবিক কারণেই অতিবাম সংস্কারের তীব্রতা শমিত হয়ে এলে ডিরোজিওপন্থী যুবকরা ক্রমে প্রাজ্ঞ হলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এঁরাই হয়ে উঠলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রাচীন সংস্কৃতির রক্ষক। হিন্দুমেলার সূত্রে আমাদের পৌরাণিক সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম নেতা হয়ে উঠেছিলেন মাইকেলের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু। দুই, ইয়ংবেঙ্গলীয়দের অন্য যে অংশ যাঁরা ডিরোজিওর গভীর চিন্তাধারার পরিবর্তে বাইরের অতিবাম দেখনদারি, স্বাধীনতার নামে নিষিদ্ধ খাদ্য ও মদ্যপান, অবাধ নারীসঙ্গ—এ সবের মধ্যেই ডুবে রইলেন—তাঁরাই হয়ে উঠলেন উনিশ শতকীয় 'বাবু'। বটতলার সাহিত্যে, কবিগানে, খ্যামটা নাচের বা সঙ নাচের আসরে তাঁরাই হলেন ব্যঙ্গ ও আক্রমণের লক্ষ্য।

আবার রামমোহনের বিশ্বাত্মবাদী সার্বজনীন ধর্মচিন্তার দ্বারা যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, ব্রহ্মসভায় যাঁরা নিয়মিত যেতেন, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁরাই সেই সংগঠনকে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামক এক প্রাতিষ্ঠানিকতার রূপে আবদ্ধ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে ব্রাহ্মসমাজ উনিশ শতকের কলকাতায় বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিশ্চানধর্মের মতোই কলকাতায় এক সমান্তরাল ধর্ম হয়ে ওঠে ব্রাহ্ম। যুগোপযোগী এই ধর্মের মধ্যেই আবার নানান উপমত গড়ে উঠল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ— কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীদের আধিপত্য একদিকে, অন্যদিকে ষাটের দশকে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের ফলে ব্রাহ্ম-হিন্দুর আন্তঃসম্পর্ক বিচিত্র দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হতে থাকে। তবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত মানুষদের অপেক্ষাকৃত উদার চিন্তাভাবনা, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের কাজে যুক্ত থাকা, পরোপকারের চিন্তা, এবং নারীমুক্তির চিন্তাভাবনা নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজকে বিপুলভাবে এগিয়ে দিয়েছিল। দীনবন্ধুর *সধবার একাদশী*-তে ব্রাহ্মদের এমন আদর্শের কথাও আছে।

তবে সংস্কারপন্থী নব্যযুবক আর প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলদের এই মতাদর্শগত সংঘাতের ভিতর থেকেই উঠে আসে নতুন এক মানবতাবোধ—রামমোহন হয়ে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পথেরই পথিক। সনাতন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দানগুলিকে গ্রহণ করেই তাঁরা ইউরোপের আধুনিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে তার সংশ্লেষণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। উনিশ শতকীয় জাগরণের অগ্রপথিক ছিলেন এই মানবতাবাদী চিন্তাবিদরাই।

এতক্ষণ উনিশ শতকের কলকাতার যে-পরিচয় আমরা পেলাম, তা একান্তভাবেই ভদ্রলোকশ্রেণির জীবনচর্চা। এই শ্রেণির হাতে নির্মিত সাহিত্যই নাগরিক সাহিত্য বা ভদ্রলোকের সাহিত্য। ভাষা ও শব্দের দিক থেকে এই সাহিত্য স্বভাবতই ছিল বিশুদ্ধবাদী। আমাদের বর্তমান সাহিত্যচর্চার ধারা এই নাগরিক সাহিত্য ধারারই উত্তরাধিকার বহন করছে।

এর বিপরীতে ছিল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী মফস্‌সলের আমজনতার সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এই আমজনতা সাধারণত অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ যাঁদের

সংস্কৃতি ছিল আমাদের খাঁটি দেশজ সংস্কৃতি, যেমন যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, সঙ্ ও খ্যামটা নাচ প্রভৃতি। নিম্নবর্গের মানুষদের এই সংস্কৃতি তৎকালীন ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে ছিল নিম্নরুচির সংস্কৃতি, ইতর রুচির সংস্কৃতি। মজার বিষয় হলো এই ইতর রুচির সংস্কৃতিই আবার তথাকথিত 'বাবু'দের অত্যন্ত পছন্দের বিষয় ছিল। তাঁরা প্রচুর টাকা খরচ করে বিখ্যাত কবিয়ালদের নিয়ে আসতেন, যাত্রা দল কিনতেন, পারিবারিক উৎসবে সে-সব নিয়ে মেতে থাকতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বাঙালি হিন্দুর জাতিসত্তা গঠনের কর্মযজ্ঞ চলে। সেই জাতিসত্তা গঠন পর্বে ভদ্র বাঙালির নীতিবাগীশ মানসিকতা প্রকট হয়ে ওঠে। জীবনকে সবরকমভাবে শৃঙ্খলিত করতে গিয়ে ভদ্রলোকেরা আমজনতার সংস্কৃতিকে ইতর রুচির সংস্কৃতি বলে বাতিল করে। হাফ-আখড়াই, খ্যামটা নাচ, বাইজি নাচ, সঙ নাচ এমনকী যাত্রা-থিয়েটার পর্যন্ত ইতর, জঘন্য অশ্লীল বলে গণ্য হল। ১৮৭৩-এ বেঙ্গল থিয়েটারে বারাঙ্গনা পল্লি থেকে পাঁচজন অভিনেত্রী নেওয়া হলে ক্রমে ভদ্রলোক-শ্রেণির চোখে থিয়েটার হয়ে উঠল যুবকদের বেল্লেলেপনা ও চরিত্র নষ্ট করবার জায়গা। ১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারত সংস্কার সভা' (The Indian Reform Association) গঠন করে সমাজের ইতর ও অশ্লীল রুচি নিবারণের চেষ্টা করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি গঠন করেন Society for the Suppression of Public Obscenity—যার উদ্দেশ্য ছিল জনগণের নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষা করা। ১৮৭৫-এর চৈত্র সংক্রান্তিতে কলকাতার কাঁসারিপাড়ার বিখ্যাত সঙের নাচের মিছিলে পুলিশ কমিশনার হগ হামলা করেন।

যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে ভদ্রজনের নাগরিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমজনতার সাহিত্য ও সংস্কৃতির লড়াই সেই সময়পর্বের অন্যতম উপভোগ্য বিষয়। আমজনতার সাহিত্য বটতলার সাহিত্য হিসেবে অবহেলিত হল। বটতলার প্রকাশকরাও ভদ্রলোকের ও প্রশাসনের চোখে টার্গেট হয়ে গেলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দুই-শ্রেণির সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব সেই সময়ের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। বটতলার গল্পে কাহিনিতে, কবিতায় ভদ্র বাবুরা হলেন ব্যঙ্গের উপকরণ। কবিগানে, সঙের নাচে বাবুদের কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে গান বাঁধলেন লোকশিল্পীরা। অন্যদিকে শিক্ষিত বাবুদের কেউ কেউ নিজের শ্রেণির মানুষদের দোষ-ত্রুটি বিচ্যুতি স্খলন ও বিকৃতি নিয়ে ব্যঙ্গমূলক নক্সা ও প্রহসন লিখলেন। এভাবেই সৃষ্টি হল টেকচাঁদ ঠাকুরের *আলালের ঘরের দুলাল*, কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমের *হুতোম প্যাঁচার নক্সা*। মধুসূদন লিখলেন—*একেই কি বলে সভ্যতা?* ও *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*। আর দীনবন্ধু সৃষ্টি করলেন অবিস্মরণীয় *সধবার একাদশী*। এই রচনাগুলিকে হয়তো বা ভদ্রশ্রেণির আত্মবীক্ষাও বলা চলে।